মাতৃমৃত্যুহার হ্রাসে ধীরগতি চ্যালেঞ্জের মুখে এমডিজি অর্জন

শাহনাজ শারমীন

বিশ্বের যেসব দেশে মাতৃমৃত্যুহার বেশি, বাংলাদেশ তার অন্যতম। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে প্রতি এক লাখ শিশু জন্মদানের সময় মাতৃমত্যুর হার ১৪৩ জনে নামিয়ে আনার কথা বলা হলেও, এই সংখ্যা এখনো অনেক বেশি।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এক লাখ জীবিত সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এখনো ২৯০ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। যদিও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল বা ইউএনএফপিএ ও ইউনিসেফ বলছে, এই হার আরো অনেক বেশি। এর মূল কারণ মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত। এমনকি আগামী পাঁচ বছরেও প্রসূতিসেবা সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সেক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর হার কমবে না। আর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৫ বা এমডিজি ৫ অর্জিত হবে না।

সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২১ থেকে ২৩ হাজার মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। এর জন্য বাল্যবিয়ে, অল্প বয়সে মা হওয়া, পুষ্টির অভাব, জরুরি প্রসূতিসেবার অভাবকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এমডিজি ৫ অনুযায়ী, মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০১৫ সালের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ কমাতে হবে। ১৯৯০ সালে এক লাখ জীবিত জন্মে ৫৭৪ জন মায়ের মৃত্যু হতো। ২০১৫ সালে তা কমিয়ে ১৪৩ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : ৪০ শতাংশ নারী গর্ভধারণকালে চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারেন না। ৮২ শতাংশ মা প্রসবের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পান না। প্রসব-পরবর্তী সেবা পান না ৭৯ শতাংশ মা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 'হেলথ বুলেটিন ২০০৯'-এ বলা হয়েছে, ৪৬ শতাংশ গর্ভবতী নারী রক্তশূন্যতায় ভোগেন। ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগেই ৫৭ শতাংশ কিশোরী মা হচ্ছেন। গর্ভকালীন বা প্রসব জটিলতার কারণে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ নারী দীর্ঘমেয়াদে পঙ্গুত্বের শিকার হচ্ছেন। শুধু ফিস্টুলা (বিলম্বিত প্রসবের কারণে সৃষ্ট প্রজননতন্ত্রের জটিলতা) সমস্যায় ভুগছেন দেশের ৭১ হাজার নারী।

মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবা ও মাতৃমৃত্যুবিষয়ক সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের মৃত্যুর ২০ শতাংশই প্রসবজনিত কারণে ঘটছে। ওই প্রতিবেদনে মাতৃমত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে প্রসবজনিত রক্তক্ষরণকে দায়ী করা হয়েছে। ২৯ শতাংশ মা এ সমস্যায় মারা যাচ্ছেন। অন্যদিকে ২৪ শতাংশ মায়ের মৃত্যু ঘটছে খিঁচুনির কারণে।

ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৯-এর তথ্যমতে, যেসব নারী প্রসবপূর্ব পরিচর্যা পান নি, তাঁদের মৃত্যুর হার যাঁরা সেবা পেয়েছেন তাঁদের তুলনায় ২০ ভাগ বেশি। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০০৭-এর তথ্যমতে, ৪০ শতাংশ নারী গর্ভধারণকালে কোনো সেবা পান না। গর্ভকালীন জটিলতা হলে ১৯ শতাংশ নারীর কোনো সেবা পাওয়ার সুযোগ নেই।

সন্তান জন্ম দেওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় মাতৃমৃত্যু ও রোগগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে সবচেয়ে বেশি। এ ঝুঁকি কমপক্ষে ৪২ দিন পর্যন্ত বজায় থাকে। অথচ দেশের মাত্র ২১ শতাংশ মা এই সেবা পাচ্ছেন।

বিভিন্ন জরিপ এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, বাড়ি থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সেবা না-পাওয়া, সেবা সম্পর্কে না-জানা, খারাপ পরিবহণব্যবস্থা, পর্যাপ্ত রাস্তাঘাটের অভাব, প্রসবের সময় বাইরের লোকের উপস্থিতির ব্যাপারে সাংস্কৃতিক বাধা, স্বামীর একক সিদ্ধান্ত, চিকিৎসা-ব্যয় এ দেশের নারীদের জরুরি প্রসূতিসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা। আবার সরকার যে সেবা দিচ্ছে তার মধ্যেও বৈষম্য লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকারি মাতৃস্বাস্থ্যসেবা শহরের মানুষের চেয়ে গ্রামের মানুষ কম পাচ্ছে। অন্যদিকে ধনিক শ্রেণির মানুষ দরিদ্রদের চেয়ে বেশি সেবা পাচ্ছে।

অল্পবয়সে বিয়ে ও ঘন ঘন সন্তান জন্মদানের কারণে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং এর ফলে মারাত্মক অসুস্থতার কারণে মাতৃমৃত্যুর হার বাড়ছে। এছাড়া পরিবারে মেয়েরা অবহেলার শিকার হয় বলে শৈশব থেকেই তারা রক্তশূন্যতাসহ নানা রোগের জটিলতায় ভোগে। এক্ষেত্রে যথাযথ চিকিৎসাসেবাও নেয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক অসচ্ছলতার বিষয়টিও এতে কাজ করে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মেয়েদের গর্ভধারণের বয়স ২০ বছর ধরা হয়ে থাকে। এ বয়সে সন্তান ধারণের জন্য শরীরের গঠন ও সুস্থতা উপযুক্ত হয়ে থাকে। গর্ভে সন্তান ধারণ করতে হলে একজন মায়ের শরীরে যেসব উপাদান থাকা দরকার, তা এই বয়সের নিচে হলে থাকে না। এ কারণে বাল্যবিয়ে মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের ভূমিকা রাখে।

এমডিজি ৫ অর্জনে সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একাধিক কর্মসূচি চলছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে জরুরি প্রসূতিসেবা সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৫ হাজার দক্ষ প্রসব-সহায়তাকারী তৈরি করার কথা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের আর্থিক সহায়তায় দেশব্যাপী দক্ষ প্রসব-সহায়তাকারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (সিএসবিএ) চলছে। এতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে অবস্ট্রেটিক্যাল অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ওজিএসবি)। তবে গত জুন পর্যন্ত মাত্র পাঁচ হাজার দক্ষ প্রসব-সহায়তাকারী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বাকি ১০ হাজার কর্মী কবে নাগাদ প্রশিক্ষণ পাবেন তা অনিশ্চিত।

এছাড়া 'ডিম্যান্ড সাইড ফিন্যান্সিং : মেটারন্যাল হেলথ ভাউচার স্কিম' নামের একটি প্রকল্প ৩৩টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাধ্যমে জাতীয় ফিস্টুলা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আছে নবজাতক ও শিশুরোগ নিরাময়ে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি। তবে জাতীয়ভিত্তিক না-হওয়ায় এসব প্রকল্পের প্রভাব খুব সামান্য। তাছাড়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানো, দক্ষ সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রতিটি প্রসব করানো এবং যেকোনো জটিলতার সময় জরুরি প্রসূতিসেবা নিশ্চিত করা না-গেলে এমডিজির এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে মাতৃমৃত্যুহার প্রতি লাখে ৯ জন, আফ্রিকাতে ২০ জন, এশিয়াতে ৩৩০ জন এবং লাতিন আমেরিকাতে ১৩০ জন। মাতৃমৃত্যুহারের এই তারতম্যের মূল কারণ হচ্ছে প্রসবপূর্ব, প্রসবোত্তর ও প্রসবকালীন সেবার তারতম্য। তবে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার কম। আগের তুলনায় এখন বেশি মানুষ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হচ্ছে। শহরের শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ শতকরা ৪৫ ভাগ। গ্রামে-গঞ্জেও সচেতনতা বাড়ছে। তারপরও আশানুরূপ সাফল্য পেতে সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগ বাস্তবায়নে আন্তরিকতা আর তদারকির কোনো বিকল্প নেই। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোও একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। সেক্ষেত্রে গণমাধ্যম ভালো ভূমিকা রাখতে পারে।

শাহনাজ শারমীন সিনিয়র রিপোর্টার ও নিউজ প্রেজেন্টার, এবিসি রেডিও এফএম ৮৯.২। sharmeen_73@yahoo.com